যুগান্তর

তারিখ ...২৬ APR 2009...
পৃষ্ঠা ...৫... কলাম ...২...

ড. মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী

মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়ন

নতুন সরকার দায়িত্ব নেয়ার পর দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর কথা বলা হয়েছে। এ লক্ষ্যে নতুন কোন শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি গঠন নয় বরং ড. কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন এবং ড. শামসুল হক কমিটির আলোকে সিদ্ধান্ত ও কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করার একটি পর্যালোচনা কমিটি গঠন করা হয়েছে। এরই মধ্যে দেশে জঙ্গিবাদের ইস্যুটি আবারও বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠেছে, এতে কোন কোন মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকের সম্পৃক্ততার কথা মিডিয়ায় উঠে এসেছে। কোন কোন মন্ত্রী জঙ্গিবাদ নির্মূল বা দমনের জন্য দেশের কওমি মাদ্রাসা তথা মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার আধুনিকায়নের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছেন। বিষয়টিকে একপক্ষ মাদ্রাসা শিক্ষাবিরোধী ষড়যন্ত্র ও ধর্মবিরোধী অভিযান বলে মাঠ গরম করতে শুরু করেছে, অন্যপক্ষ ধর্মীয় স্পর্শকাতর ইস্যু বলে চুপচাপ অবলোকন করছে। অতীতেও দেশে মাদ্রাসা শিক্ষা নিয়ে এভাবে পক্ষে-বিপক্ষে বিভক্তি ও দলীয় অবস্থান নিয়ে অনেককে দাঁড়াতে দেখা গেছে। এতে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার আধুনিকায়ন নিয়ে সরকারের কোন পরিকল্পনা থাকলেও তা শেষ পর্যন্ত কার্যকর করা যায়নি। এভাবেই মাদ্রাসা শিক্ষা নিয়ে সব উদ্যোগ ভেস্তে গেছে। এবার শেষ পর্যন্ত কী হবে তা আগাম বলা সম্ভব নয়। আমরা আশা করব সমস্যার গভীরে সব মহলই প্রবেশের চেষ্টা করবে, দেশের মাদ্রাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে। মূলধারার শিক্ষা ব্যবস্থায় এবার যদি সত্যিসত্যিই বড় ধরনের পরিবর্তন আনা হয়, সেক্ষেত্রে মাদ্রাসা শিক্ষার পিছিয়ে থাকার অবকাশ নেই। যারা থাকবেন তারা মাদ্রাসা শিক্ষারই অশেষ ক্ষতি করবেন।

মাদ্রাসা শিক্ষায় মোটাদাগে দু'টি ধারা বিরাজ করছে। একটি আলিয়া, অপরটি কওমি। এর বাইরে নূরানি, হাফেজিয়া, ক্যাডেট মাদ্রাসা, বিদেশী সংস্থার পরিচালিত মাদ্রাসা ইত্যাদি রয়েছে। আলিয়া মাদ্রাসা ব্রিটিশদের অনুমোদন ও অনুদানে শুরু হয়েছিল। ভারতবর্ষের মুসলমানদের মধ্যে যারা ব্রিটিশ শাসকদের ওই অর্থায়ন ও অনুমোদনকে সমর্থন করেননি তারা উনবিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকে দেওবন্দে (উত্তরপ্রদেশের একটি থানা) নিজস্ব অর্থ, দানখয়রাত, চাঁদা ও সাহায্য-সহযোগিতায় কওমি (জাতীয়) নামে পৃথক ধারার মাদ্রাসা গড়ে তোলেন। আলিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করা থেকে এদের নাম খারিজিও বলা হয়ে থাকে। কওমি মাদ্রাসা মূলত কোরআন-হাদিস শেখার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। নূরানি মাদ্রাসা বলে পরিচিত প্রতিষ্ঠানগুলো শুদ্ধভাবে কোরআন শিক্ষার কথা বলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। হাফেজিয়া মাদ্রাসায় ছাত্রদের কোরআন মুখস্থ করানো হয়ে থাকে। ক্যাডেট নাম ধারণ করে দেশের শহরগুলোর অভিজাত এলাকায় বেশ কিছু মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, হালে গ্রামে-গঞ্জেও বিভিন্ন নামে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। এগুলো ধর্ম শিক্ষার পাশাপাশি ইংরেজিসহ আধুনিক কিছু বিষয়ও তাদের শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত করেছে। কিছু আরব দেশ, সংস্থা ও ব্যক্তি বিশেষের অর্থায়নে দেশে বেশ কিছু মাদ্রাসা বেশ সচ্ছলভাবে চলছে। তবে আলিয়া ও কওমি এই দুই ধারার মাদ্রাসা গ্রাম, গঞ্জ ও শহরগুলোর সর্বত্র বিস্তার লাভ করেছে।

দেশে সাধারণ তথা আলিয়া নামধারী মাদ্রাসার সংখ্যা প্রায় ত্রিশ হাজার, এর বেশিরভাগ মাদ্রাসা বাংলাদেশ মাদ্রাসা বোর্ডের অনুমোদন প্রাপ্ত। ওই বোর্ডের অনুমোদিত শিক্ষাক্রম অনুসারে লিখিত বই-পুস্তক ছাত্রছাত্রীরা পড়ছে। মাদ্রাসা বোর্ডের অধীন অনুষ্ঠিত পাবলিক পরীক্ষায় এসব মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষা দিচ্ছে। ধর্ম-শিক্ষার পাশাপাশি এসব মাদ্রাসায় বাংলা, ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিভাগেরও শিক্ষাক্রম রয়েছে। স্বীকৃতিপ্রাপ্ত মাদ্রাসাগুলোর শিক্ষক-কর্মচারীরা এমপিওভুক্ত। তাদের মূল বেতন ১০০ শতাংশ সরকার বহন করছে। তবে স্বীকার করতে হবে বেশিরভাগ মাদ্রাসায় শিক্ষার পরিবেশ, পাঠক্রম, অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা খুব একটা ভালো নয়।

দেশে কওমি মাদ্রাসার সংখ্যা নিয়ে আমরা গোলক ধাঁধায় আছি। কেউ বলছেন ২০ হাজার, কেউ বলছেন ৪০ হাজার কওমি মাদ্রাসা দেশে রয়েছে। ছাত্রসংখ্যা নিয়েও চলছে অনুরূপ নানা রকম তথ্য প্রদান। কেউ বলছেন কওমি মাদ্রাসায় ৩০ লাখ, কেউ বলছেন ৪০ লাখ ছাত্রছাত্রী পড়ছে। তবে হাতেগোনা দু-চারটি ছাড়া সবক'টি কওমি মাদ্রাসায়ই কোরআন-হাদিস ছাড়া অন্য বিষয়ের পঠনপাঠন হয় না। কিছু কিছু কওমি মাদ্রাসায় অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বাংলা, গণিত ও কম্পিউটার শিক্ষা চালু করলেও তা এখনও নামমাত্র পর্যায়ে রয়েছে। বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রী অত্যন্ত দরিদ্র পরিবার থেকে আগত; অনাথ, এতিমদের ধর্ম শিক্ষাই কওমি মাদ্রাসায় বছরের পর বছর ধরে চলে আসছে। কওমি মাদ্রাসার অভিন্ন কোন শিক্ষা বোর্ড নেই। তবে দেশে অঞ্চলভিত্তিক কয়েকটি কওমি শিক্ষা বোর্ড তথা বেফকুল মাদারাসিল আরাবিয়া (বেফাক) রয়েছে যেগুলো নিজস্ব পাঠ্যক্রম ও পরীক্ষা পদ্ধতিতে অধীনস্থ কওমি মাদ্রাসাগুলোকে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। কওমি মাদ্রাসাগুলো মূলতই দান-খয়রাত, দেশী-বিদেশী সাহায্য সংস্থা ও ব্যক্তির অনুদানের ওপর নির্ভরশীল। দীর্ঘদিন থেকে এভাবেই প্রতিষ্ঠানগুলো চলে আসছে। ফলে এগুলোর ওপর বিভিন্ন ব্যক্তি ও রাজনৈতিক দলের প্রভাবকে একেবারে অস্বীকার করার উপায় নেই। সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ কোন মন্ত্রণালয় বা কর্তৃপক্ষ এসব প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করার অধিকার রাখে না। সুতরাং এগুলোর পঠনপাঠন, আর্থিক স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা দেখভাল বা তদারকি করা যাচ্ছে না বা হচ্ছে না। আলিয়া মাদ্রাসাগুলো থেকে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের একটি অংশ মূলধারার সাধারণ শিক্ষা ও পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করছে, প্রতিযোগিতায় অনেকে বেশ ভালোও করছে, তারা সরকারি-বেসরকারি নানা চাকরিতে অবতীর্ণ হতে পারলেও কওমি মাদ্রাসা থেকে ডিগ্রি নিয়ে বের হয়ে আসা শিক্ষার্থীরা কোথাও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতেই পারছে না, ভালো কোন সরকারি বা বেসরকারি চাকরিতে আসতেও পারছে না। বেশির ভাগ শিক্ষার্থীর দক্ষতা বৃদ্ধির মতো পাঠক্রম, পঠনপাঠন, শিক্ষার পরিবেশ কওমি শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলছে না। যুগযুগ ধরে কওমি শিক্ষা একটি বৃত্তের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে, অপরদিকে আলিয়া মাদ্রাসায় সীমিত আকারের হলেও পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। ফলে জীবন ও জীবিকা নিয়ে আলিয়া মাদ্রাসার তুলনায় কওমি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা চরম অনিশ্চয়তায় পড়ছে, দারিদ্র্যের সীমানা অতিক্রম করা বেশিরভাগ শিক্ষার্থীর পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। এ ধরনের পরিস্থিতি যে কোন শিক্ষার্থীর মধ্যে হীনমন্যতা জাগিয়ে তুলতে পারে সেটি গুরুত্বের সঙ্গে ভাবা হচ্ছে না। বাস্তবতা হচ্ছে, কওমি মাদ্রাসা যদিও কওমি তথা জাতীয় নাম ধারণ করেছে, কিন্তু এর পঠনপাঠনে দেশ, জাতি ও বিশ্বপরিস্থিতি সম্পর্কে গ্রহণযোগ্য কোন ধারণা সৃষ্টির মোটেও সুযোগ নেই। এক্ষেত্রে মৌলিক বেশ কিছু সমস্যা রয়েছে। সমস্যাগুলো ঐতিহাসিক অর্থাৎ বহু পুরনো। সে সম্পর্কে উদাসীন হলে চলবে না বরং আন্তরিক হতে হবে যুক্তি ও বাস্তববাদী। মনে রাখতে হবে, কওমি মাদ্রাসার সঙ্গে যুক্ত অনেকেরই রুটি-রুজির বিষয়টি এই সমস্যার সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত। এ প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষক বা পরিচালক হিসেবে যুক্ত থেকে তাঁদের অনেকেই একভাবে জীবন-জীবিকা নির্বাহ করছেন। নিঃসন্দেহে তাদের শিক্ষাদীক্ষা, অভিজ্ঞতা ও চিন্তাভাবনা বেশ পুরনো। যখনই পাঠ্যক্রম পরিবর্তনের কথা ওঠে তখনই তারা ভাবেন, এর ফলে তাদের বাদ দেয়ার সম্ভাবনা তৈরি হবে, তাতে তাদের রুটি-রুজি হুমকির মুখে পড়বে। যুগ যুগ ধরে তারা এসব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থেকে যেভাবে জীবন-জীবিকা নির্বাহ করে আসছেন তাতে তারা এক প্রকার আছেন। শিক্ষাক্রমে পরিবর্তন এলে তাদের অনেকের পক্ষেই নিজেদের প্রতিষ্ঠানেই কাজ করা সম্ভব নাও হতে পারে। এটি তাদের একটি ধারণা বা অনুমান। এর ফলে তাদের মধ্যে এক ধরনের উপার্জনহীন হওয়ার ভীতি কাজ করছে। মনে রাখতে হবে, এ পর্যায়ের শিক্ষকের সংখ্যা মোটেও কম নয়। কওমি মাদ্রাসার আধুনিকায়নের ক্ষেত্রে এ সমস্যাটিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতে হবে। গুরুত্ব দেয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের রুটি-রুজির বিষয়টি অবহেলা করা যাবে না। কেননা, এই মানুষগুলো বয়স ও শিক্ষা-সীমাবদ্ধতার কারণে অন্য কিছু করে খেতে পারবেন না। সুতরাং সরকারকে প্রথমেই এই সমস্যাটিকে মেনে নিয়েই অগ্রসর হতে হবে। যাদের এ ধরনের সমস্যা আছে তাদেরকে আশ্বস্ত করতে হবে যে কওমি মাদ্রাসায় তাদের যে চাকরি বর্তমানে রয়েছে, তা তাদের অটুট থাকবে, তাদের প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধায় মোটেও হস্তক্ষেপ করা হবে না। এক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ ও উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জনের সুযোগের বিধান রেখে আগামী কয়েক বছরে শিক্ষকদেরও একটি গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে উন্নীত করার ব্যবস্থা থাকতে হবে, যারা তা গ্রহণ ও অর্জন করতে পারবেন তারা অতিরিক্ত আর্থিক সুযোগ-সুবিধা লাভ করতে পারবেন। যারা পারবেন না তারা অন্তত চাকরিহারা হবেন না এমন ব্যবস্থা থাকতে হবে। কওমি মাদ্রাসার আধুনিকায়নের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান এই শিক্ষক চালিকা শক্তির সমস্যার সমাধান অন্য কোনভাবে হওয়া বা করার কোন সুযোগ আছে বলে মনে হয় না।

কওমি মাদ্রাসায় বর্তমান যে অনড় শিক্ষাক্রম চালু আছে তার প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধনে কওমি শিক্ষকদের অবশ্যই সম্পৃক্ত করতে হবে। তবে এর আগে শিক্ষকদের সঙ্গে পঠনপাঠন বিষয়ক বিশেষজ্ঞ মহলকে জ্ঞানের আদান-প্রদান করতে হবে। শিক্ষকদের আগে মানসিকভাবে এবং শিক্ষাদীক্ষার দিক থেকে প্রস্তুত করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজনে কওমি শিক্ষকদের নীতিনির্ধারকদের কিছু প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে হবে। প্রতিবেশী পশ্চিমবঙ্গের মাদ্রাসা শিক্ষার অভিজ্ঞতা অর্জনে তাদের সুযোগ করে দেয়া যেতে পারে। এছাড়া দিল্লির জামেয়া মিল্লিয়ার বর্তমান শিক্ষাক্রমের সঙ্গে আমাদের মাদ্রাসা শিক্ষকদের পরিচিত হওয়ার ব্যবস্থা করা খুবই জরুরি। আমার বিশ্বাস, এসব অভিজ্ঞতার সঙ্গে পরিচিত হওয়া এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের আদান-প্রদানের সুযোগ ঘটলে কওমি এবং আলিয়া মাদ্রাসা শিক্ষায় যেসব পশ্চাৎপদতা ও সমস্যা বিরাজ করছে, তা সমাধান করা সম্ভব। মাদ্রাসার ভেতরে বিরাজমান সমস্যা সমাধানে ভেতর থেকে এক ধরনের তাগিদ অনুভূত হতে হবে। আমরা দীর্ঘদিন ওপর থেকে পরিবর্তনের কথা বলে আসছি, নানাভাবে চাপ দিচ্ছি। তাতে কিন্তু কাজের কাজ তেমন কিছু হচ্ছে না। মাদ্রাসা শিক্ষায় পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা ভেতরে ভেতরে হয়তো কিছুটা হলেও আছে, কিন্তু ভেতরে যারা পরিবর্তন চাচ্ছেন তারা আওয়ামী লীগ সরকারকে সব সময় ধর্মবিরোধী হিসেবে শুনে আসছেন। একটি মহল সেভাবেই এতদিন বিষয়গুলো প্রচার করে আসছে। সেই প্রচারের ফলে এক ধরনের ভীতি ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে কাজ করছে। এর ফলে উভয় ধারার মাদ্রাসা শিক্ষার মধ্যেই এক ধরনের আত্মরক্ষার প্রবণতা, আওয়ামীবিরোধী রাজনৈতিক দলের কাছে আত্মসমর্পণ করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। দেশে ভোট ও রাজনীতিতে মাদ্রাসাগুলো আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে, বিএনপি-জামায়াতের পক্ষে অবস্থান নিচ্ছে, শেষ বিচারে মাদ্রাসা শিক্ষা রাজনৈতিক দল ও সেই মেরুকরণে বিভক্ত হয়ে আছে। এ ধরনের অবস্থান থেকে মাদ্রাসাকে এর নিজস্ব অবস্থানে ফিরিয়ে আনতে সরকার এবং মাদ্রাসা শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের উদ্যোগ নিতে হবে, সব অবিশ্বাস, অপপ্রচার, পশ্চাৎপদতা ও জড়তাকে অতিক্রম করার উদ্যোগ নিতে হবে। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে কওমি মাদ্রাসার নীতিনির্ধারকদের আলোচনা এই প্রক্রিয়ার একটি প্রাথমিক গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ বলে ধরা যায়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং মাদ্রাসা শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের এক্ষেত্রে আরও বেশি কাছাকাছি আসতে হবে, কাজ করতে হবে। মাদ্রাসার পঠনপাঠন, পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষকসহ প্রয়োজনীয় সব ক্ষেত্রেই আধুনিকায়নের পরিকল্পনা নিয়ে তাদের অগ্রসর হতে হবে। খুব কম সময়ের মধ্যে নয়, বরং স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিয়ে মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিকায়নের কথা ভাবতে হবে। ধর্ম শিক্ষার পাশাপাশি সাধারণ শিক্ষার শিক্ষাক্রমকে নানা উদ্যোগ ও সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে এগিয়ে নেয়ার জন্য সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে বিশেষ একটি সেল গঠন করে কাজটি এগিয়ে নিতে হবে। সামগ্রিক এই বিষয়টিকে গুরুত্বে ধারণ করতে হবে, এরপরই কেবল আধুনিকায়ন ও বাস্তবায়ন সম্ভব।

ড. মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী : অধ্যাপক, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়